□□□□□ :□ □□□□□□□□,□□□□□□□ □□□□□ :□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□

রিসার্চ ইনশিয়িটেভিস, বাংলাদেশ - এর উদ্যোগে গত ২৮ নভেম্বর, ২০১৪ সরিডাপ অডিটোরিয়ামে "কোরবান আলী স্মারক গোলটেবিল ডায়ালগ: বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ভূমি ব্যবহার, কৃষির চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা" শীর্ষক ডায়ালগ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রহিব-এর নির্বাহী পরিচালক মেহেনা গুহঠাকুরতা এবং কী-নোট পেপার উপস্থাপন করেন রহিব এর "Fostering Agrarian Strategies for Overcoming Small Farmers Challenges" প্রকল্পের কো-অর্ডিনেটর সুরাইয়া বেগম। প্রকল্প পেটিজার্মানীর রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং-এর আর্থিক সহায়তায় ২০১৩ সাল হতে পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানের মূল বিষয়গুলোকে এখানে উপস্থাপন করা হল। এর উপর লিখিত মতামত দেবার জন্য অনুরোধ করা হল সবাইকে।

□□□□□ □□□□□ :□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□,□□□□□□ □□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□

বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম খাত কৃষি এবং দেশের জনসংখ্যার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ কৃষক। কৃষি বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল ও অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি এবং জনগোষ্ঠীর অধিকাংশের প্রধান পেশা। খাদ্য নিরাপত্তা, কর্ম সংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি চালু রাখতে এই খাতের গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ দেশের খাদ্য শস্যের চাহিদার প্রায় ৯৫% সরবরাহ করেন এদেশের কৃষক। কিন্তু এই গরিষ্ঠ সংখ্যক কৃষক তার নিজের চাহিদা পূরণ করতে পারে না বিভিন্ন ধরনের সমস্যার কারণে, বিশেষ করে চাষযোগ্য ভূমি সিত্বের অভাবের কারণে। ২০০৮ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশের ২,৮১,৬৫,৭০০ পরিবারের মধ্যে ৫৩.৫৭% পরিবারের চাষযোগ্য জমি আছে এবং অবশিষ্ট ৪৬.৬৩% পরিবারের চাষযোগ্য কোন জমি নেই। যাদের চাষযোগ্য জমি আছে তাদের মধ্যে ৩৮.৬৩% পরিবার প্রান্তিক কৃষক (০.০২-০.২০ হে:), ৪৯.৮৫% ক্ষুদ্র কৃষক (০.২১-১.০ হে:), ১০.৩৪% মাঝারি কৃষক (১.০ হে: এর বেশী থেকে ৩.০ হে: এর কম) এবং অবশিষ্ট ১.১৭% পরিবার বড় কৃষক (৩.০ হে: এর অধিক) পরিবারের আওতাভুক্ত। প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারগুলো একত্রে দেশের মোট কৃষক পরিবারের ৮৮.৪৮% হলেও তাদের মালিকানাধীন চাষযোগ্য জমির পরিমাণ মাত্র ৩৬.৩০%। অন্যদিকে দেশের মাত্র ১১.৫১% মাঝারি এবং বড় কৃষক পরিবারগুলোর মালিকানায় রয়েছে দেশের মোট চাষযোগ্য জমির ৬৩.৩৭%।

ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যে নিজের জমিতে চাষ করার সাথে সাথে অন্যের জমি বর্গা বা লীজ নিয়ে চাষ করেন; কখনও শ্রমিক হিসেবেও অন্যের জমিতে কাজ করেন। ক্ষেতমজুর নাকি কৃষক - এই পরিচয় সুস্পষ্ট করার ক্ষেত্রে যা দ্বন্দ্ব বের স্বষ্টি করে। অন্যদিকে কঠোর বাস্তবতা হচ্ছে, যেসব কৃষি পরিবার কৃষি খাতের কোন আয় যোগ হয়না তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ছিটকে পড়ে কৃষিকাজ থেকে, যা কৃষিতে নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে থাকে। আবার কৃষিতে বৃহৎ পুঁজি বিনিয়োগ শুরু হয়েছে এবং বানিজ্যিক কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের বড় বড় ব্যবসায়ী এবং কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো কৃষি জমি ইজারা নিয়ে বিনিয়োগ করছে। কৃষিজমিতে মার্কেট, কমিউনিটি সেন্টার তৈরী এবং হাউজিং ব্যবসার অনুপ্রবেশ ঘটছে এবং কৃষি জমি অকৃষি খাতে চলে যাচ্ছে। জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৩ তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রতি বছর কৃষি জমির পরিমাণ প্রায় ১% শতাংশ হারে হ্রাস পাচ্ছে। এসব কিছুই কৃষকের ভূমি মালিকানা স্বত্ব ও ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন স্বষ্টিতে ভূমিকা

রাখছে একথা বলা যায়। অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে পুঁজির প্রবাহ বৃদ্ধি পেলেও কৃষক ভালো আছে একথা কেউ বলতে পারছে না।

ভূমি ব্যবহার বা মালিকানার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বা সরকারী পর্যায়ে ১৭৯৩ সালের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত', ১৮৮৫ সালের 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন', ১৯৫০ সালের 'পূর্ব বঙ্গ জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের' ধারাবাহিকতায় ১৯৮৪ সালে 'ভূমি সিংস্কার অধ্যাদেশ' প্রণীত হয়। এ অধ্যাদেশে অনুযায়ী ভূমির মালিক ও বর্গাদারের মধ্যে চুক্তি হতে হবে লিখিত, যা অন্তত ৫ বছরের জন্য বলবৎ থাকবে এবং বর্গাদারের সক্ষম উত্তরাধিকারী থাকলে তিনিও বর্গাদারিত্ব পাবেন। সেখানে উৎপাদিত ফসল তিন ভাগ হবে: এক ভাগ ভূমি মালিক, এক ভাগ বর্গাদার এবং এক ভাগ যে পক্ষ বীজ, সার ও সেচের খরচ বহন করবে সেই পক্ষ পাবে, অর্থাৎ অর্ধশতাব্দি কালের পুরাতন তেভাগা আন্দোলনের দাবী বাস্তবায়িত হয়। এছাড়া বেনামী লেনদেন ও কৃষি পেশাজীবীদের বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ বাতিল করা হয় এবং পরিবার বা প্রতিষ্ঠান পিছু কৃষি জমির পরিমাণ সর্বোচ্চ ৬০ বিঘা (১ বিঘা= ৩৩ শতক) নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া ১৯৮৯ সালে 'ঋণ সালিশী আইন' এবং ২০১৩ সালে 'জাতীয় কৃষি নীতি' প্রণীত হয়।

এই প্রকল্পটি রহিব "Fostering Agrarian Strategies for Overcoming Small Farmers Challenges" শিরোনামে তিন বছরের একটি গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করছে ২০১৩ থেকে। প্রকল্পে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও উত্তরণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এগ্রো ইকোলজিক্যাল জোন-কে ভিত্তি করে বাংলাদেশের পটুয়াখালী, নওগাঁ, বগুড়া, দিনাজপুর এবং নীলফামারী - প্রতিটি জেলাতে একটি গ্রামকে কেন্দ্র করে কাজটি করা হয়েছে।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ভূমিস্বত্ব ও ভূমির ব্যবহার এবং কৃষির ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা বিদ্যমান সে সম্পর্কে তথ্য অন্বেষণ এই কাজের বিষয়বস্তু। এ কাজে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক এবং ক্ষেতমজুরদের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ও দলীয় আলোচনা, বিভিন্ন সরকারি কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার সাথে আলোচনা, পাঁচটি এলাকায় জরিপ, সফলতার কাহিনী সংগ্রহ এবং নাগরিক সমাজ ও রাজনৈতিক দলের সদস্যদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে।

আমাদের মাঠ অভিজ্ঞতা এবং জরিপ থেকে এটা উঠে এসেছে যে, গ্রামাঞ্চলে এখন বর্গা নেবার তুলনায় ক্যাশ লীজ বা কন্ট্রাক্ট নেবার হার বেশী এবং এটি ক্রমশ: বৃদ্ধি পাচ্ছে। লীজ জনপ্রিয় হচ্ছে কারণ এর ফলে ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক কৃষক স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির মালিকানা স্বত্ব নিরবচ্ছিন্নভাবে ভোগ করে। যা কিনা তার বেঁচে থাকার এবং আত্ম উন্নয়নের মূল দিক। আগে কৃষকের লক্ষ্য থাকত টাকা জমিয়ে জমি কিনোর কিন্তু এখন কৃষক জমি কিনোর বদলে লীজ নিতে আগ্রহী। কারণ গ্রামাঞ্চলে পুঁজির অনুপ্রবেশের ফলে জমির দাম গত ১০-১৫ বছরে ক্রমবর্ধমানভাবে অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। যা কৃষকের নাগালের বাইরে চলে গেছে। ফলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক ক্রমশ: লীজ ও কন্ট্রাক্ট প্রথার দিকে ঝুঁকছে।

লীজ ও কন্ট্রাক্ট নেবার মূল কারণ ভূমিহীনতা, নিজস্ব জমি কম থাকা, টাকা খাটানো, চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ এবং আয় বৃদ্ধি করা। বিনিময় মূল্যের ক্ষেত্রে পণ্যের বদলে ক্যাশ টাকার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, যা কিনা দুপক্ষই মনে করছে তারা লাভবান হচ্ছে। এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যে, একটি পদ্ধতি জমির মালিক এবং চাষী দুপক্ষকেই সন্তুষ্ট করছে। যা আমাদের কাজের মধ্যে দিয়ে বের হয়েছে। জমির মালিক খুশি কারণ বর্গা ব্যবস্থায় ফসলের অর্ধেক ভাগ দিয়ে দিতে হয় বলে বর্গাচাষী জমিতে যথেষ্ট পরিমাণ শ্রম বিনিয়োগ করে না। দ্বিতীয়ত : জমিতে

ফসল বেশি হলেও অনুপস্থিতি জমির মালিক হওয়ার কারণে সঠিক উৎপাদনের পরিমাণ জানতে পারে না বলে তারা মনে করে এবং ভাবে যে, একারণে ভাগে কম পাচ্ছে। অন্যদিকে ফসল নষ্ট হলে পুরোটাই ক্ষতি। তার তুলনায় লীজের মাধ্যমে বা সরিক একটি নির্দিষ্ট অর্থ যদি অগ্রিম পাওয়া যায় তা অন্য কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে পারে, যেমন ব্যবসা বা সঞ্চয়পত্র ক্রয়। তাদের ধারণা সঞ্চয়পত্র থেকে যে পরিমাণ সুদ তারা পেতে পারে তা বর্গাচাষ হতে প্রাপ্ত ফসল হতে বেশি। লীজ বা বন্দক প্রক্রিয়াতে গেলে সে অর্থ জমির প্রতি কোন বিনিয়োগ না করেই রিটার্ন পাওয়া যায়, ফলে জমির মালিক সন্তুষ্ট। অন্যদিকে কৃষক সন্তুষ্ট কারণ সে জানে অর্থের বিনিময়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতার নিজস্ব মালিকানার অধীন থাকবে একটি নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী। ফলে এই জমিতে সে তার সর্বোচ্চ শ্রম বিনিয়োগ করে সর্বোচ্চ উৎপাদন পেতে পারে। যার ভাগীদার ১০০% সে নিজেই। এই প্রক্রিয়ায় সে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করতে পারে। যে উদ্বৃত্ত তাকে উন্নয়নের দিকে এবং সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। এটি তাকে এক ধরনের নিশ্চয়তা প্রদান করে থাকে। যদি কোন কারণে কোন একটি ফসল নষ্ট হয় তাহলে পরবর্তী ফসলের মাধ্যমে সে ক্ষতি পুষিয়ে নেবারও একটা ব্যবস্থা থাকে। এই প্রক্রিয়ায় জমির মালিকের প্রতি তার দায়বদ্ধতাও কম থাকে।

অন্যদিকে ফসল কন্ট্রাক্ট পদ্ধতিতে কোন জমি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসলের বিনিময় চুক্তিতে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চাষাবাদ করা যায়। ফসল ওঠার পর জমির মালিক নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল কৃষকের কাছ থেকে জমি ব্যবহার করা বাবদ গ্রহণ করেন। জমির মালিক চাষাবাদের কোন খরচ বহন করেন না, খরচ ও ঝুঁকি উভয়ই জমি কিন্ট্রাক্ট নেয়া কৃষকের।

এলাকাভিত্তিক অন্যান্য যে বিষয়গুলো উল্লেখ করার মত তা হচ্ছে : নীলফামারী মঙ্গাপ্রবন এলাকা হিসাবে চিহ্নিত, জোতদারের হার কম। ফলে কৃষকের নিজ জমি চাষের প্রবনতা বেশি। এখানে লীজ গ্রহণকারীর সংখ্যা বেশি। পটুয়াখালী এলাকার কলাপাড়া সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা। এলাকায় নোনাজলের প্রভাব বেশি। এই এলাকায় খায়খালাসী প্রথা বেশি চলে এবং ফসলের বিনিময়ে কন্ট্রাক্ট প্রথা বেশি প্রচলিত। নওগাঁ বরেন্দ্র এলাকা হবার কারণে ভূমি ব্যবহারে কৃষকের নিজস্ব সম্পৃক্ততা বেশি। বিশেষ করে ধনী জমি আমবাগানে পরিণত করার প্রবনতা বৃদ্ধি কারণে জমি লীজ ও বর্গা দেবার প্রবণতা কম। বগুড়াতে সবজী চাষের প্রাধান্য বেশি, বিশেষ করে সারিয়াকান্দিতে মরিচের চাষ হয় বেশি। যা কিনা হাই ভ্যালু ক্যাশ ক্রপ হিসেবে পরিচিত। দিনাজপুর ধান উৎপাদনের এলাকা। এখানে সুগন্ধী চাল উৎপাদন হয় ফলে জমি লীজ দেবার এবং নেবার প্রবনতা বেশি। এখানে জোতদারের হাতে থাকা জমির পরিমাণ অনেক বেশি।

□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□

কৃষি ও কৃষকের সমস্যা চিরন্তন এবং অব্যাহত, তবে সমস্যার ধরন কখনও কখনও পরিবর্তিত হয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে কৃষকেরা যে সমস্যাগুলো তুলে ধরেছে তার মধ্যে অন্যতম :

১. কৃষকদের প্রধান সমস্যা মধ্যস্বত্বভোগী। হাট আর ক্রেতার মধ্যে বাজার দরের অনেক পার্থক্য থাকে। সরকারের উচিত এরকম কোন দায়িত্ব নেওয়া যাতে কৃষকরা সরাসরি পণ্য বিক্রি করতে পারে।
২. কৃষিতে মজুরদের মজুরির হার সব জায়গায় অভিন্ন নয়।
৩. কৃষি জমি, অকৃষি কাজে ব্যবহার হচ্ছে।
৪. গ্রামে কর্পোরেট পুঁজির প্রবেশ ঘটছে, এতে ছোট চাষীরা মার খাচ্ছে
৫. কৃষকরা সংগঠিত হতে পারেনো নিরিক্ষরতার কারণে
৬. কৃষক উপযোগী বাজারজাতকরণ পলিসি নেই
৭. কর্মকর্তা ও রাজনীতিবিদদের মধ্যে সততা ও জবাবদিহিতার অভাব
৮. সরকারী অফিসে আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব
৯. কৃষকদের প্রযুক্তি গ্রহণ করার মানসিকতা এখনও প্রাথমিক অবস্থায় নেতিবাচক।

কৃষকের সমস্যা কৃষক ভালো বোঝে - তাই কৃষকের কাছ থেকেই এ বিষয়ে আরও বিশদভাবে জানার জন্য অনুষ্ঠানে আগত পাঁচ জেলার কৃষকদেরকে এই পর্যায়ে আহ্বান জানানো হয় তাদের চ্যালেঞ্জের কথা সকলের সামনে তুলে ধরার জন্য। নীচে তাদের বক্তব্য তুলে ধরা হল।

দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ী উপজেলার লালপুর গ্রামের কৃষক আবুল খায়ের বলেন, কৃষকের অবস্থা হচ্ছে ‘সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা, ঔষধ দিবি কোথা’। বাজারে সার কিনতে গেলে ভেজাল পাওয়া যায়, যেটা ২০ কেজির জায়গায় ৪০ কেজি দিলেও কাজ হয় না। দোকানদাররা ওজনে কম দেয়, প্রতিবাদ করলে বলে তারা এভাবেই এনেছে। এছাড়া মাঝে মাঝে সার সংকট দেখা যায়। গত ক’বছর ধরেই আমন মৌসুমে সার সংকট দেখা গেছে। গত বছর চিনিকাটার ধানে পোকার আক্রমণে প্রায় ১ একর জমির ধান নষ্ট হয়ে গেছিল, প্রয়োজনীয় পরামর্শ কারও কাছ থেকে পাননি। এবছর সিজনেটা কেমিপানির একটা ঔষধ দেয়াতে সমস্যাটা হয়নি। কিন্তু এ ঔষধটার দাম অনেক বেশী, আর ব্যাপক চাহিদার কারণে এখন ভেজাল পাওয়া যাচ্ছে। রহিব এর সাথে গণগবেষণা শুরু করার পর থেকে যে কোন কৃষি উপকরণ ক্রয়ের সময় মেমো বা বিল সংগ্রহ করা শুরু করেছেন, যেন ভেজাল হলে অভিযোগ করা যায়। নীতিনির্ধারকদের প্রতি অনুরোধ রেখেছেন হাইব্রীড বীজ না করে উফশী বীজ করতে, যেন কৃষকরা বীজ সংরক্ষণ ও ব্যবহার করতে পারে। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষিখাত সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এখানেও কৃষক কোন ক্ষতিপূরণ পায় না।

নীলফামারী জেলার ডিমিলা উপজেলার পচারহাট গ্রামের শচীন্দ্রনাথ বলেন, কৃষকের কোন সংগঠন না থাকার কারণে কৃষকরা এক সুরে কথা বলতে পারেনা, ফলে কেউ কৃষকের কথা শুনেনা। যদি সম্মিলিতভাবে বলা যায়, তাহলে সবাই শুনবে। কৃষি কাজের জন্য মাটি পরীক্ষা খুবই জরুরি, কিন্তু এখন মাটি পরীক্ষা করতে অনেক ভোগান্তি, এ ব্যাপারে কোন কৃষকবান্ধব পদ্ধতি বের করতে পারলে ভাল হত। কৃষি পরামর্শের কোন বিকল্প নেই, কিন্তু সরকারী কর্মকর্তাদের পাওয়া যায় না, এ ব্যাপারেও দৃষ্টি দেয়া দরকার। এছাড়া কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে ভাল হবে।
নওগাঁর মহাদেবপুর উপজেলার মাইনুল ইসলাম জানান তার এলাকায় ডিপি টিউবওয়েলে বেশী টাকা নেয়া হয়। এছাড়া ইউনিয়নে প্রায় ৯-১০টি ইটভাটা রয়েছে, যার কারণে সব উঁচু জমিতো সমান হয়েছেই, এখন কৃষি জমির মাটিও ইটভাটায় চলে যাচ্ছে। ১-২ ফুট মাটি ১০- ২০হাজার টাকায় লোকজন বিক্রি করে দিচ্ছে, যার ফলে সেচ দেয়ার সময় আশপাশের জমি থেকে পানি চলে আসছে, ফলে সেও মাটি বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে।

পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার এলমেপুর গ্রামের কৃষক মো: মোশাররফ হোসেন বলেন, তার এলাকায় বড়ৌবাঁধের স্লুইসগেটগুলোর খুব খারাপ অবস্থা, সেগুলো মেরামত করে পরিচালনা কমিটি করলে গ্রামটা লবনাক্ততা থেকে মুক্তি পেতো। কেননা স্লুইসগেট পরিচালনা কমিটি না থাকায় যে যার সুবিধামত পানি ছেড়ে দেয়। এর ফলে লবণাক্ততার কারণে সাধারণ কৃষক তার জমিতে চাষাবাদ করতে পারে না। এছাড়া খাল খনন ও ড্রেনের মাধ্যমে এলমেপুর গ্রামের কৃষি উৎপাদন আরও বাড়ানো সম্ভব। তবে তার সবচেয়ে বড় সমস্যা, গ্রামের রাস্তাটা। সেটা কাঁচা হওয়ায় কৃষি উপকরণ ও পণ্য পরিবহন করতে সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলার হাটফুলবাড়ী ইউনিয়নের নয়াপাড়া গ্রামের কৃষক আনসার আলী বলেন, গ্রামে বেগুন বিক্রি করে এলেন ৬ টাকায়, ঢাকায় সেটা ৪০ টাকা। কৃষকরা মূলত বাজারেই আটকা পড়ে যাচ্ছে। আর এখন দিনমজুররা নয় কৃষকদেরকেই কৃষি জমিতে আগে আগে গিয়ে মজুরদের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। এছাড়া এখন প্রয়োজনীয় সময়ে দিনমজুর পাওয়া যায় না। অধিকাংশ কৃষক নিরক্ষর হলেও চাষাবাদ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা আছে এবং সে ধারণা থেকেই লাভজনক ফসলের চাষাবাদ শুরু করেছে। যেমন, আগে নয়াপাড়া গ্রামে মাত্র দুই জন টমেটো চাষ করত, এখন প্রায় ৫০ জনের বেশী কৃষক টমেটো চাষ করছে। তবে ফসল বা সবজি চাষ করতে গিয়ে একবার ভাইরাস বা পোকা আক্রমন করলে পুরো ক্ষেতের ফসল নষ্ট হয়ে যায়। মিডিয়াতে কৃষক বা কৃষির বিভিন্ন সফলতা প্রচার হয়, কিন্তু কৃষকরা যে কী পরিমাণ ঝুঁকির মধ্যে আছে তা কেউ দেখছে না।

তার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বলেন, তার ছেলে স্কুলে আশানুরূপ ফলাফল না করায় তিনি শিক্ষককে কারণ

জিজ্ঞেস করেছিলেন। উত্তরে শিক্ষক বলেছিলেন, আপনি চাষী মানুষ; এসব বুঝবেন না। কৃষককে এরকমভাবেই সবক্ষেত্রে অবমূল্যায়িত হতে হয়। তিনি বলেন, "আমার ছেলেকে আমি কখনও কৃষক বানাবো না। দরকার হলে সে ছোট চাকুরী করবে, কিন্তু কৃষিকাজ করাবো না। এটা শুধু আমার নয়, আশপাশের সব কৃষকেরই মনের কথা। এরকম হলে ভবিষ্যতে কৃষিকাজ করবে কারা ?" তার মতে, কৃষি বা কৃষক নিয়ে কাজ করলে দেশের লাভ বৈ ক্ষতি হবে না। কৃষি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহকে তিনি মাঠে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করে ফসলের রোগ-বালাই থেকে উৎপাদন খরচ - সব কিছু হিসেব করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। আরও বলেন, দেশ উন্নত করতে হলে কৃষি ও কৃষককে উন্নত করতে হবে। কৃষক আর্থনৈতিকভাবে, সামাজিকভাবে এবং রাজনৈতিকভাবে মার খাচ্ছে। কৃষকের ভয়সেকে সামনে আনার সুযোগ করে দিতে হবে।
এ পর্যায়ে প্রকল্প সমন্বয়ক সুরাইয়া বেগম বিগত দু'বছরে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে রিভিউ আয়োজিত ডায়ালগে অংশগ্রহণকারী রাজনীতিবিদ ও সরকারী- বেসরকারী কৃষিকর্মকর্তাদের মতামত সকলের সামনে তুলে ধরেন, যা নিম্নে বর্ণনা করা হল।

□□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□

প্রকল্পের কাজ করতে গিয়ে আলোচনা করা হয়েছে গ্রামের কৃষক জনগোষ্ঠী, স্থানীয় নাগরিক সমাজ, সরকারের কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা এবং দেশের মূলধারার এবং বামপন্থী রাজনৈতিক দলের স্থানীয় এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ের সদস্যদের সাথে। রাজনৈতিক দলকে বিশেষভাবে আলোচনায় প্রাধান্য দেয়া হয়েছে এ-কারণে যে, কৃষকের সমস্যাগুলো যাতে রাজনৈতিক দলের স্থানীয় পর্যায়ে এবং নীতিনির্ধারক পর্যায়ে আলোচনা করা হয় এবং গুরুত্ব পায়। একই সাথে চাওয়া হয় যে, রাজনৈতিক দলের দলীয় মেনিফেস্টোতে কৃষির সমস্যাগুলো অন্তর্ভুক্ত হোক। যদিও এটি খুব সহজ কাজ নয়, তবুও শুরু করা হয়েছে এই বিষয়ে কথা বলা। এ পর্যন্ত আমরা ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগ, আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন- কৃষক লীগ, বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রী, জাতীয় গণফ্রন্ট, জাতীয় পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি, কৃষক সমিতি, ঐক্য ন্যাপ (পঙ্কজ ভট্টাচার্য), জাতীয় কৃষক জোট, ছাত্র ইউনিয়ন, গণফোরাম,যুব ইউনিয়ন, ক্ষেতমজুর সমিতি, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল প্রমুখ রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলা হয়েছে।

কৃষকের অবস্থান নিয়ে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যদের সাথে আলোচনা করা হয়েছিল তাদের দৃষ্টিভঙ্গি জানার জন্য যে, কৃষকের সমস্যা নিয়ে তারা এবং তাদের দল কিভাবে কাজ করছে তা নিয়ে। রাজনৈতিক দলের আভ্যন্তরীণ মিটিংগুলোতে কৃষিনীতি, ভূমিনীতি, কৃষকের সমস্যা নিয়ে খুব বিস্তৃত আলোচনা করে কিনা এবং সিদ্ধান্তগুলো দলকে তৃণমূল থেকে জানানো হয় কিনা। এ প্রসঙ্গে জানা যায় যে, রাজনৈতিক দলগুলোতে কৃষি বিষয়ক অঙ্গসংগঠনগুলোতে কৃষক প্রতিনিধি যথার্থ ব্যক্তি না হওয়ার ফলে কৃষকদের কথা বলার মত কেউ থাকে না। দলের অঙ্গ-সংগঠন হিসেবে এলাকায় কৃষকদের সমর্থনের জন্য দলীয় কাজ পরিচালনার কারণেই দলের কমিটি গঠন করা হয় এবং স্থানীয় একজন নেতাকে প্রধান হিসেবে বসিয়ে দেয়া হয়। সেই ব্যক্তির কৃষি সম্পর্কে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা থাকুক বা না থাকুক। অধিকাংশ রাজনৈতিক দল ও তাদের কৃষক সংগঠনের বাংলাদেশের সমাজ বিশ্লেষণে অপারগতা প্রকট এবং কৃষক সমাজ তাদের সংগঠনের ভিতি নিয়। দলের সদস্যদের মধ্যে হতাশা যে, বিভিন্ন সিদ্ধান্ত কেন্দ্র থেকে আসে, সবকিছু ওপর থেকে চাপিয়ে দেয়া হয়, তৃণমূল থেকে কোন কিছু ওপরে যায় না।

দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীদের সাথে কৃষি প্রশ্নে যেসব বিষয় আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দিকগুলো নীচে তুলে ধরা হলো:

- রাজনীতির জগতে রাজনৈতিক নেতার ব্যক্তিত্ব একটা বড় ফ্যাক্টর। একটা সময় ছিল, যখন ১ বা ২ জন ব্যক্তি কৃষকদের কথা অনেকে বেশী ফোকাস নিয়ে এসেছিলেন। যেমন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জননেতা মওলানা ভাসানী, কমরেড মনি সিংহ, কমরেড মোজাফফর আহমদ প্রমুখ। রাজনীতিতে এই ধরনের নিবেদিতপ্রাণ নেতৃত্বের এখন বড় অভাব।

- রাজনৈতিক দলে যারা কৃষকের প্রতিনিধিত্ব করেন তারা অধিকাংশই কৃষক নন।
- রাজনৈতিক দলে কেন্দ্রীয়, জেলা পর্যায়ে মিটিং হয়; কিন্তু কৃষি নিয়ে তেমন কোন আলোচনা হয়না। মিটিং এ কৃষকদের ইস্যু তুললেও কোন ফল পাওয়া যায় না। দলের মতাদর্শে কৃষক প্রাধান্য পায় না। নাম মাত্র হিসেবে কৃষক

সংগঠনরে পদগুলো পূরণ করা হয়।

- রাজনৈতিক দলরে সদস্যদরে সাথে কৃষকদরে যোগাযোগ আগরে মত নেই। স্থানীয় নতোরা মাঠে বা কৃষকরে কাছে যায় না, কৃষকও তাদরে কাছে আসে না।
- বর্তমান পুঁজিবাদী প্রক্ষাপটে সমাজতন্ত্র/মার্ক্সবাদকে ভুয়া প্রমাণ করার চষ্টো তব্যাহত আছে, কিন্তু মানুষ স্বপ্ন দখেে একটা বৈষম্যহীন রাষ্ট্ররে। কিন্তু সোভিয়তে ইউনিয়ন পতনরে পর সব শষে হয়ে গেছে, অনকে বাম নতো আদর্শ থকেে বচ্যুত হয়েছেন, মানসিকতা বদলে গেছে। আশার আলো না থাকলে মানুষ নিয়তিবাদী হয়ে যায়, ফলে কৃষক/শ্রমিক/ছাত্র কোন সংগঠনই শক্তিশালী হতে পারছে না। আর সংগঠন ছাড়া এসব সমাধান করা দুরহ কাজ। কৃষকরে সমস্যা তাই কঠিন হয়ে যাচ্ছে কৃষকরে কাছে।
- মার্ক্সবাদ/লেনিনবাদ চীন বা রাশিয়াতে যভোবে হয়েছে, সভোবে বাংলাদশেে স্থাপন করা যাবে না। এদশেরে বাস্তবতায় ব্যবস্থা নতিে হবে, কিন্তু কোথায় নেে সব কিছু আটকে আছে। নেতেনেভাবে সংসদে যাওয়াই এখন রাজনৈতিক দলরে লক্ষ্য। কৃষক ভোট পলিটিক্সে কোথায় আটকে আছে, তা বোঝে না। আলাদা কিছু হওয়া দরকার।
- কৃষকরে সমস্যা ও উত্তরণ নিয়ে কাজ করার কথা বাম ও রাজনৈতিক দলগুলোর, কিন্তু এখন সটো করছে এনজিও-রা। এমনকি বিভিন্ন আলোচনার প্লাটফর্মও তারা তৈরি করছে। অথচ যারা নিজেদেরকে সমাজ পরিবর্তনরে কর্মী হসিবেে পরিচয় দিয়ে থাকে, তাদরে দায়িত্ব ছিল কৃষকদরে সংগঠিত করা।
- রাজনীতিতে নিস্বঃকরণ প্রক্রিয়া চলছে। কৃষক পানির জন্য, সাররে জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে গুলি, লাঠির বাড়ি খাচ্ছে কিন্তু তাদরে পাশে দাঁড়ানোর মত এবং তাদেরকে নিয়ে ধারাবাহিকভাবে কাজ করার মত সংগঠন নেই।
- কৃষকরে ৩টা প্রধান শত্রুঃ ১. সাম্রাজ্যবাদ: যা দশেীয় কৃষিজাত ধ্বংস করে দিচ্ছে, ২. পুঁজিবাদ: অনুপাদনশীল পুঁজির অনুপ্রবশে এবং লুটরো পুঁজির বিকাশ হচ্ছে, ৩. মৌলবাদ: নারীদরে সামনে এগিয়ে আসতে বাঁধা দিচ্ছে।
- দশেে বিপ্লবী পশোজীবিনেই, যারা কিনা অন্ন-বস্ত্র সংস্থানরে জন্য সময় ব্যয় না করে দশেরে জন্য কাজ করবে। এসব পশোজীবিদরে জীবিকা নির্বাহরে ভার নওেয়া উচিত রাজনৈতিক দলরে। যাতে তারা নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যেতে পারে।
- আমাদরে দশেরে গ্রামাঞ্চলরে খাদ্য সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে বানিজ্যিক পুঁজির অনুপ্রবশেরে ফলে। ছোট ছোট উদ্যোক্তারা বৃহৎ পুঁজির সঙ্গে পেরে উঠছেনা, তারা হারিয়ে যাচ্ছে। শুধুমাত্র নীচ থকেে আন্দোলন করে এসব সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়, এখানে রাষ্ট্ররে দায়িত্ব নিতে হবে।
- রাষ্ট্র ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন গবষেণা সম্পাদন করে, সগেুলোর মাধ্যমে আবার কৃষকদরে শোষণরে নতুন নতুন হাতিয়ার তৈরি করা হয়।
- জাতীয় সংসদে কৃষকরে কোন প্রতিনিধি নেই।
- লজেুড়বৃত্তি চর্চার কারণে রাজনৈতিক দলে প্রকৃত কৃষকদরে কোন প্রতিনিধি নেই।
- কৃষকরা জাতীয়তাবাদভিত্তিক দলগুলো থকেে বাম দলগুলোকে এবং ডানপন্থী দলগুলোকে আলাদা করতে পারছে না।
- বাম সংগঠনগুলো ইস্যুভিত্তিক কাজ করে, যা কিনা অর্থনীতি-কেন্দ্রীক হওয়া উচিত।
- কৃষকদরে দর কষাকষি করার মত কোন সংগঠন নেই। কৃষিতে নারীর অবস্থা আরও খারাপ।
- আজকে জমি কৃষকরে কাছে নেই। এমনকি ভোগার সার্থকতাও ধরে রাখা যাচ্ছে না।
- সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে রাষ্ট্র, উপরে ঠিক থাকলে নিচেও ঠিক থাকবে।
- এখন জোতদাররে হাতেও জমি থাকছে না। অনুপস্থিত জমির মালকিদরে হাতে জমি চলে যাচ্ছে। ফলে লীজ, কন্ট্রাক্ট বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- এদশেরে কৃষকরা স্বউদ্যগেে কাজ করে যাচ্ছে এবং অর্থনীতির চাকা সচল রাখছেন। উৎপাদনরে মাধ্যমে। অথচ সংসদে কৃষি ও কৃষক নিয়ে আলোচনা প্রাধান্য পাচ্ছে না। কৃষককে ভাল রাখতে হলে তার উৎপাদনরে মূল্য তাকে দিতে হবে। গাড়ী, মোবাইল, ইলেক্ট্রনিক্স পণ্যরে দাম অনেক বাড়লেও মানুষ তা মেনে নেয়, কিন্তু আলু-পটলরে দাম একটু বাড়লেই সোচ্চার হয় এবং মিডিয়াতে ফোকাস করা হয়। অর্থাৎ ব্যবসায়ীদরে মুনাফা স্বীকার করা হয়, কৃষকরে নয়।

- রাষ্ট্র উৎপাদনে সাহায্য করছে, কিন্তু কৃষক উৎপাদিত ফসলরে দাম পাবে কিনা তার নিশ্চয়তা নেই। রাষ্ট্র বাজার তৈরি করতে পারেনি। কৃষক বেঁচতে গিয়ে একবার ঠকে, কিনতে গিয়ে আরেকবার ঠকে। এখানে কাজ করা দরকার।
- তৃণমূল থকেে আন্দোলন না হলে রাষ্ট্ররে উদ্যোগে ভূমি সংস্কার করা সম্ভব হবে না।
- কৃষকরা বিভিন্ন ধোঁকা খাওয়ার ফলে এখন রাষ্ট্র, নতো, রাজনৈতিক দল কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না।
- সমস্যা সমাধানরে জন্য কৃষকদরে নিজেদেরে সম্মিলিত আন্দোলন করতে হবে।

- রাজনৈতিক দলের আন্দোলনের ফসল কৃষকের কাছে পৌঁছাচ্ছে না। এ ব্যর্থতার ফলে রাজনৈতিক দলের প্রতি কৃষকের আস্থাহীনতা সৃষ্টি হয়েছে। এর দায়ভার দলের নেতাদের নিতে হবে এবং কৃষকের আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে।
- বর্তমানের কৃষি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও-র শোষণের শিকার। এ অবস্থার উত্তরণে যথার্থ কৃষি ভূমি নীতি করতে হবে।
- এনজিও-রা কৃষকদের নিয়ে সেভাবে কাজ করে না; কৃষি উপকরণ ডিলার, কর্মকর্তা ও নেতাদের যে যোগসাজশ তা নিয়ে তারা কথা বলে না। রাজনীতিবিদদের প্রতিনিয়ত এনজিও- কালচারের সাথে যুদ্ধ করতে হচ্ছে।
- সরকারী কৃষি কর্মকর্তাদের বাবু মানসিকতা পরিহার করে কৃষক বান্ধব ভাবে কাজ করতে হবে। কৃষি অফিসে কৃষকদের প্রবেশাধিকারকে উৎসাহিত করতে হবে।
- শিক্ষার অভাবের কারণে কৃষকরা উন্নতি করতে পারে না। তাই শিক্ষা ব্যবস্থায় কৃষি বিষয়কে জোরালো ভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে। শিক্ষিত জনগোষ্ঠী কৃষিতে আগ্রহী হলে পরিস্থিতি বদলে যাবে।
- কৃষেমজুররা বেশী মজুরী চাচ্ছে, কিন্তু কৃষকরা দিতে অপরাগ। ফলে মজুররা শহরে চলে যাচ্ছে।
- বর্তমানে অস্থিতিশীল রাজনীতি একটা বড় সমস্যা। বিশেষ করে সরকারে যারা আছেন তারা বুঝছেন যে, জঙ্গীবাদ এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা তাদেরকে সুস্থির থাকতে দিচ্ছেনা। এসব বিরোধিতা সামাল দিতেই কৃষির মত অন্যান্য বিষয়গুলোতে যথাযথ নজর দেয়া সম্ভব হচ্ছে না।
- গবেষণা সংস্থাগুলো যদি তাদের গবেষণার ফলাফল সরকারের কাছে তুলে ধরে তাহলে হয়ত সরকারি পলিসিতে তার প্রভাব পড়বে।
- কৃষক সংগঠন ছাড়া কৃষক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, এজন্যে কৃষক নেতৃত্ব দরকার।

সুপারিশ হিসেবে কিছু দিক নির্দেশনাও রাজনৈতিক দলের সদস্যদের কাছ থেকে এসছে। যেমন :

১) কৃষির উন্নয়নে স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচীভিত্তিক কাজ ঠিক করে এগুতে হবে এবং স্বল্প মেয়াদী কর্মসূচী সরকারের কাছ থেকে জোর করে আদায় করতে হবে।
২) পুঁজিবাদকে স্বীকার করে নিয়েই কৃষকের সমস্যার সমাধানে কাজ করা।

৩) অনুপস্থিত জমির মালিকরা জমি লীজ দিয়ে থাকেন। সেক্ষেত্রে সরকার তাদের কাছ থেকে জমি ভাড়া নিয়ে প্রকৃত উৎপাদক কৃষকদের দীর্ঘমেয়াদে লীজ দিতে পারে। এই জমি সমবায় বা ভূমি ব্যাংকের মাধ্যমে দেওয়া যেতে পারে।
৪) সম্মিলিতভাবে চাষাবাদ বা সমবায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমস্যার উত্তরণে কাজ করা যায়।
৫) সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে পরিবর্তন সম্ভব এবং জমি-জিমা সবই হবে রাষ্ট্রের।
৬) বর্তমানে বাজার ব্যবস্থা, মধ্যস্বত্বভোগী বাজার ব্যবস্থা না হয়ে হওয়া উচিৎ উৎপাদন- ভোক্তা কেন্দ্রিক বাজার ব্যবস্থা।
৭) বামদলগুলোকে প্রয়োগ্রামভিত্তিক কাজের পরিবর্তে অর্থনীতিকেন্দ্রিক কাজ করতে হবে ।
৮) কৃষকের অবস্থা এবং সমাজ পরিবর্তনের জন্যে দেশে বিপ্লবী পেশাজীবি তৈরী করতে হবে।

বাম চিন্তাধারার রাজনৈতিক দলের বক্তব্য হচ্ছে তারা সাময়িক লক্ষ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য হচ্ছে ক) সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন খ) মেহনতী মানুষের পক্ষে সরকার গঠন। সাময়িক লক্ষ্য হচ্ছে বিভিন্ন বেসিক ডিমান্ড পূরণ যেমন, খাস জমির সুষম বন্টন, সারা বছরের কাজের নিশ্চয়তা, ফসলের লাভজনক মূল্য, কৃষি উপকরণের দাম কমানো, গ্রামে রেশনিং ইত্যাদি। সরকারের কাছে তাদের এসব দাবী। সরকার যাতে এসব দাবী পূরণ করে সেই লক্ষ্যে সমিতির পক্ষ থেকে নিয়মিত ঘেরাও, মিছিল, মিটিং, র‍্যালী কর্মসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে। ১৯৮৪ সালের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ, নব্বই-এর দশকে ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমির বন্টন, বর্তমানের

কৃষিকার্ড, শস্য বীমা ইত্যাদি এসব তাদের দীর্ঘ আন্দোলনের ফসল।

একসময় বাম রাজনৈতিক দলগুলোর বৃহৎ কৃষক সংগঠন ছিল, যারা ভোগা, খাস জমি বিন্টন, কৃষেমজুরদের মজুরী বৃদ্ধির মত বড় বড় আন্দোলন করেছে। বর্তমানে এ-ধরনের শক্তিশালী কৃষক সংগঠন দেখা যাচ্ছে না।

কৃষক নিয়ে আলোচনা করার সময় দেখা গেছে রাজনৈতিক দলের সদস্যরা আত্মসমালোচনা করেছেন। ঢাকার বাইরে এটা বেশি দেখা গেছে, কারণ তাদের মধ্যে কৃষক নিয়ে ভাবনা গুরুত্ব লাভ করে থাকে এবং তারা খোলামেলা কথা বলেছেন। এক অর্থে নিজেদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করেছেন এবং সেখানে রাজনীতি প্রধান বিষয় হিসেবে এসেছে। যা তুলে ধরে যে, কৃষি, কৃষিভূমির ব্যবহার, ভূমিস্বত্ব এবং কৃষকের সমস্যা তথা কৃষি প্রশ্ন - আসলে রাজনৈতিক ইস্যু এবং এসবের সমাধান রাজনৈতিকভাবেই করতে হবে।

প্রকল্পে রহিব যে গণগবেষণার মাধ্যমে কৃষক দল গঠন করেছে সে সম্পর্কে আলোচনা হয়। গণগবেষণা দলে মূলত কৃষকরা নিজেদের সমস্যা নিজেরা চিহ্নিত করেন, সমস্যার সমাধানে দিক নির্দেশনা দান করেন এবং সমাধানে বাস্তব কার্যক্রম গ্রহণ করেন। এই আদর্শ নিয়ে প্রকল্পের কৃষক দলগুলো কী ধরনের কাজ করছে সে সম্পর্কে নীলফামারীর ও দিনাজপুরের গবেষণা সহকারী মো: আমজাদ হোসেন ও মো: সাইদুর রহমান বক্তব্য রাখেন। আমজাদ বলেন, গ্রামে কাজ করতে গিয়ে কৃষকদের নানা সমস্যার কথা শুনতে হয়। বর্তমানে ডিমিলা উপজেলার পচারহাট গ্রামের কৃষকদের সমন্বয়ে গঠিত গণগবেষণা দলের কৃষকরা তাদের সমস্যা, এর কারণসমূহ এবং সমাধানের উপায় খুঁজে বের করার জন্য গণগবেষণা মিটিং করছে। এ এলাকায় বছরের নির্দিষ্ট কিছু সময় (ফাল্গুন- চৈত্র ও আশ্বিন-কার্তিক মাসে) কাজ থাকে না, ফলে অর্থ বা খাবারও থাকে না। এ থেকে পরিত্রাণের জন্য তারা দলগতভাবে অর্থ সঞ্চয় ও ভূট্টা চাষ করছে। এছাড়া বীজ ব্যাংক ও ধান ব্যাংক করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এজন্যে কৃষকরা গণগবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

দিনাজপুর জেলায় কর্মরত গবেষণা সহকারী সাইদুর রহমান বলেন, ফুলবাড়ী উপজেলার লালপুর গ্রামের কৃষকের অনেক সমস্যার মধ্যে একটা হচ্ছে বাজারে ফসল বা শাক-সবজি বিক্রি করতে গিয়ে অতিরিক্ত তোলা প্রদান করতে হয়। গণগবেষণা দলের সদস্যরা এজন্য সরকার নির্ধারিত তোলার হারের তালিকা সংগ্রহ করে গ্রামের কৃষকদের মাঝে বিতরণ করে দিয়েছে, ফলে এখন আর অতিরিক্ত টাকা নিতে পারে না।
এই ধরনের সফলতা কৃষির বিশাল সমস্যার প্রেক্ষাপটে খুবই ক্ষীণ একটি আশার রেখা। এটিকে আরও দৃঢ় করতে হলে প্রশ্ন তুলতে হবে যে, আমাদের ভ'মিকা কি হওয়া উচিত? এই বিদ্যমান অবস্থার প্রেক্ষিতে আমাদের কী করণীয় সে সম্পর্কে খোলামেলা মত প্রকাশের জন্যে আহবান জানানো হয়। যেমন-

১. কৃষি ও কৃষককে রক্ষার জন্যে রাজনৈতিক দলসমূহের কী ভূমিকা?
২. রাষ্ট্রের ভূমিকা
৩. বেসরকারি সংগঠন- যারা কৃষি ও কৃষিভূমি নিয়ে কাজ করছেন তাদের ভূমিকা
৪. গবেষক ও শিক্ষাবিদদের ভূমিকা
৫. কৃষকের ভূমিকা কি হওয়া জরুরী।

এই পর্বে মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণে সকলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

□□□□□ □□□□□□

মুক্ত আলোচনায় সবাই গঠনমূলক বক্তব্য রাখেন। এখানে ব্যক্তির বক্তব্য নয়, বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের প্রেক্ষিতে তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো তুলে ধরা হল:

□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধিরা কৃষকদের সমস্যার প্রকৃতি বলেন, ইউরিয়া সার ৬ মাসের বেশী বস্তাবন্দি থাকলে নষ্ট হয়ে যায়। ইউরিয়া ছাড়াও অন্য কোন নষ্ট বা ভেজাল সার পেলে সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। এখন দেশে অনেক কম্পানি কীটনাশক উৎপাদন ও বিপননের সাথে জড়িত, এর মধ্যে অনেক ভেজাল কম্পানিও আছে। যারা অনৈতিকভাবে তাদের ব্যবসা চালু রেখেছে। এরকম ভেজাল কীটনাশক পেলেও সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কাছে জানাতে হবে। সচে- এর ব্যাপারে ১৯২৭ সালের একটা আইন আছে। এ ব্যাপারে নতুন আইন দরকার। কৃষকদের সবচেয়ে বড় সমস্যাটা এখানে পণ্য বিপিণনের ক্ষেত্রে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হলেও সফল হয়নি। গবেষণার মাধ্যমে একটা কার্যকর পদ্ধতি বের করতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে কেরপ জোনিং করা। তার থাকে যে এলাকায় যে ফসলের উপযোগী মাটি সেখানে সে ফসল করা এবং কী পরিমান চাহিদা জেনে সেই পরিমাণ উৎপাদন করা। সময়োপযোগী কৃষি জমি সুরক্ষা আইন অতিসত্বর বাস্তবায়ন করতে হবে। জরিপের মাধ্যমে প্রকৃত চাষীদের চিহ্নিত করে তাদের জমির খাজনা মওকুফ এবং যারা কৃষি কাজ করে না তাদের খাজনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কৃষি অধিদপ্তরের সংশোধিত আইন অনুযায়ী প্রতি ইউনিয়নে ৩টা করে ব্লক থাকবে, প্রতিটি ব্লকে একজন করে উপ-সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা থাকবেন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রতিটি ইউনিয়নে ১টি ব্লক ও ৮টি সাব-ব্লক রয়েছে, যার দায়িত্বে রয়েছে ১জন উপ-সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা। যেহেতু তাকে সপ্তাহে ১ কার্যদিবস অফিসে মিটিং করতে হয় ফলে বাকি ৪ কার্যদিবস মাঠ পরিদর্শন করতে পারবেন। সুতরাং কৃষকরা গ্রামে গ্রামে সমবায় সমিতি করে রাখলে প্রতি ১৫ দিনে অন্তত ১ বার করে ৮টি সাব-ব্লকের সকলের সাথে উপ-সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার মতবিনিময় করা সম্ভব, এক্ষেত্রে কৃষকদের সচেতন হতে হবে।

□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ (□□□□□ □□ □□□□□□□□)

বিএআরসি-র গবেষণা মতে বর্তমানে কৃষি জমি হ্রাসের হার ০.৪৯% (জনাব নুরুজ্জামান)। বিএআরসি বিভিন্ন ধরনের আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করছে। কিন্তু এগুলো একজনের পক্ষে ক্রয় বা পরিচালনা কষ্টসাধ্য, যদি সমবায়ের মাধ্যমে এসব যন্ত্রপাতি গ্রামে ব্যবহার করা হয় তাহলে ভাল ফল পাওয়া যাবে, এখানে বাম সংগঠনগুলো কাজ করতে পারে। রাজনীতিবিদদের গবেষণা ও মাঠ পরিদর্শন উভয়ই করতে হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে কিছু অসৎ কর্মকর্তা/ কর্মচারী থাকলেও প্রচুর কর্মঠ কর্মী রয়েছেন, আজকের কৃষি উন্নয়নে তাদের অনেক অবদান। বর্তমানে রাজনীতিবিদদের সঞ্চালনের কারণে সৎ কর্মকর্তা পাওয়া দুস্কর হয়ে গেছে। তাদেরকে বাধ্য হতে হচ্ছে কোন একটা গোষ্ঠীর সাথে সমঝোতা করে কাজ করার জন্য। ভেজাল সার বর্তমানে বাস্তব সমস্যা। দেশের ৪০-৫০% সার ভেজাল। এখানে সরকার- রাজনীতিবিদিরা সচেতন নয়। সার কোথায় ভেজাল হয় সেটা সবাই জানে, তারপরও এ সমস্যার প্রতিকার হচ্ছে না। বাংলাদেশে বীজ সেক্টরের ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। বর্তমানে নেপাল ও শ্রীলঙ্কার সাথে যৌথভাবে বীজ উৎপাদন শুরু হয়েছে। তারপরও অনৈতিক কিছু ব্যবসায়ী খারাপ বীজের ব্যবসা করছে। কিছু ফসল হাইব্রীডের কোন বিকল্প নেই, যেমন ভুট্টা। কিন্তু দেশে বিভিন্ন উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজও উদ্ভাবিত হচ্ছে, যেগুলো সংরক্ষণ ও পুনর্ব্যবহার করা যায়, যেমন ধানের ক্ষেত্রে বিরি- ৩৩, ৬৭, বিনা- ৭, লবনসহিষ্ণু বিনা- ৮,১০ প্রভৃতি। সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের দায়িত্ব এসব প্রযুক্তির সাথে কৃষকদের পরিচয় করিয়ে দেয়া। বিভিন্ন প্রতিকূল আবহাওয়া উপযোগী বিভিন্ন প্রকার ফসল ও প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হচ্ছে। এগুলো নিয়ে মাঠে যেতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কেরপ জোনিং ম্যাপ করা হয়েছে, এটাকে বাস্তবায়িত করতে হবে। শুধু শস্য বা আলু নয়, দেশে এখন সবজিরও সংরক্ষণাগার দরকার। এছাড়া বড় শহরের সুপার মার্কেটের সাথে কৃষকদের লিয়াজোঁ করিয়ে দেয়া যেতে পারে, বিএডিসি-র কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ারদের মত।

□□□□□□□□□ □□□□□□

যসেব বসেরকারি সংগঠন কৃষি ও কৃষক নিয়ে কাজ করেন তারা এই আলোচনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বলেন, এখন দিনাজপুরের সুগন্ধি ধান জিরা কাটারি ও বিরি- ৩১ এর সমন্বয়ে বিরি- ৬২ নামে একটি জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। এর চাষের বিস্তার করলে কৃষকদের লাভ হতে পারে। বীজ নিয়ে অনেক কথা হলেও বর্তমান অবস্থা ভাল নয়। এগ্রিকিলচার এডভাইজারি সোসাইটি-র ফার্ম গীড নামে বীজ উৎপাদনের একটা পদ্ধতি আছে, যেখানে কৃষকরা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ, ব্যবহার, বিপণণের সাথে সরাসরি জড়িত থাকে। কেউ এ মডেলে নিয়ে কাজ করতে চাইলে তারা সাহায্য করতে পারে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বীজ উৎপাদন করে কৃষকরা লাভবান হতে পারে। ধান ব্যাংক শুনতে অনেক ভাল লাগলেও ব্যবস্থাপনায় অনেক ঝামেলা হয়, এখানে সাবধান থাকতে হবে। বাংলাদেশে এত বেশী সংখ্যক কৃষি প্লট, যে মাটি পরীক্ষা করা অনেক কষ্টকর এবং অনেক সময় ফলও পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে Participatory Integrated Plant Management নামে একটা মেথড কৃষকরা ব্যবহার করতে পারে, এগ্রিকিলচার এডভাইজারি সোসাইটি-র সাথে যোগাযোগ করলে এ ব্যাপারে সাহায্য করা সম্ভব। সেচ বর্তমানে পুরোপুরি বিনাজি্য নির্ভর। কৃষিপণ্যের মূল্য বর্তমানে একটা অসামাধানযোগ্য সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। দিনমজুর সংকটকে বাংলাদেশের উন্নয়নের একটা লক্ষণ হিসেবে দেখা যায়। কৃষি জমি ব্যবহার যেহেতু ক্রমাশ ব্যবস্থার দিকে চলে গেছে, এটাকে কৃষকবান্ধব করতে হবে। সর্বোপরি কৃষককে লাভজনক ফসল চাষের দিকে নজর দিতে হবে। পাবনার ঈশ্বরদী এক্ষেত্রে বাস্তব উদাহরণ।
দেশে ইটভাটা নিয়ন্ত্রণ আইন রয়েছে এবং সে আইন অনুযায়ী তদন্ত করে দেখতে হবে কোন জায়গায় কৃষি জমি নিষ্ট হচ্ছে কিনা। ২০০৬ এর শ্রমিক আইন অনুযায়ী কৃষি শ্রমিকরা অধিকারগুলো পাচ্ছে কিনা দেখতে হবে এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে আইনটাকে আরও যুগোপযোগী করতে হবে। কৃষি জমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ঝুঁকিটা শুধু কৃষকের, ঝুঁকিটা দ্বি-পাক্ষিক করা যায় কিনা সেটা দেখতে হবে। সারা দেশেই ভূমি দূষণ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পাহাড়, কৃষি জমি, জলা প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপাদানগুলো ব্যাপক দূষণের শিকার হচ্ছে। জুম চাষের মত বিভিন্ন প্রাকৃতিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা সহ গবেষণার মাধ্যমে প্রকৃত অবস্থা চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিতে হবে। সাংবিধানিক সমতা নিশ্চিতকরণে জমির সিলিং ২০-২৫ বিঘার মধ্যে আনতে হবে খাস জমি ও চর সম্পৃক্ত আইনের যথাযথ কার্যকারিতা বাস্তবায়ন সহ কৃষি জমি সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করতে হবে। এছাড়া কৃষি সংক্রান্ত আইনগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□

প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো গুরুত্বের সাথে কৃষি বা কৃষককে দেখছে না। রাজনৈতিক দল, সরকার, এনজিও সকলেই কৃষককে ব্যবহার করছে নিজেদের প্রয়োজনে। রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রয়োজনে অনেককে অন্য সেক্টর থেকে এসে কৃষি সংগঠনে কাজ করতে হয়। মূল ধারার রাজনৈতিক দল বা যারা সরকার গঠন করছে, তাদের কৃষিতে কী ভূমিকা, সেটা কি সিফল না ব্যর্থ, সামগ্রিকভাবে গবেষণার দাবি রাখে।
বিশ্বের অনেক দেশে কৃষিকাজ লাভজনক হলেও বাংলাদেশে একেবারেই নয়। এজন্য আজ কেউ তার সন্তানকে কৃষক বানাতে চায় না। উন্নত দেশে তো কৃষি খাতগুলো অনেক লাভজনক হওয়ায় কৃষিতে খুব সংখ্যক মানুষ জড়িত থাকে, ফলে তারা লাভ করতে পারে, এদেশে সেটা হয়নি। বাংলাদেশে ভোক্তা তারা চায় কম দামে কৃষিপণ্য ক্রয় করতে আর কৃষকরা চায় লাভজনক দাম। এ দুইয়ের দ্বন্দ্ব নিরসন করতে হয় সরকারকে। সারের দাম কমিয়ে, ১০ টাকায় একাউন্ট খোলা ও বিভিন্নভাবে সরকার কৃষককে সাহায্য করে এটা সমাধান করার চেষ্টা করছে। এখন শিক্ষিত লোকেরা কৃষিতে আসছে না, এটা খুবই খারাপ লক্ষণ। দেশী-বিদেশী কৃষি জ্ঞান ও প্রযুক্তি আরও প্রচার-প্রসার এবং শিক্ষিত লোককে কৃষি খাতে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে এ খাতকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। এছাড়া অকৃষি খাতকে আরও লাভজনক করে তুলতে হবে, যেন কৃষি খাতে মানুষ কমে যায়।

□□□ □□

প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের কৃষিপ্লটের আয়তন খুব ছোট হওয়ায় দেখা যায় অনেক সময় ট্রাক্টর ঘুরতে পারে না, ফলে কর্ষণে সমস্যা হয়, যা উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটায়। আর উৎপাদনকারী হিসেবে কৃষকরা বাজারে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। পুঁজিবাদী ও কর্পোরেট গোষ্ঠীর কৃষিতে আনাগোনার ফলে একদিকে যেমন ভূমিদস্যুতা শুরু হয়েছে অন্যদিকে বাজারে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করছে। এছাড়া জমিতে ব্যাপক সার ব্যবহারের ফলে মাটির উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে। পর্যাপ্ত কোল্ড স্টোরেজ ও সংরক্ষণাগার না থাকায় কৃষিপণ্য সংরক্ষণ করা যাচ্ছে না, ফলে কৃষক পর্যাপ্ত মূল্য পাচ্ছে না। বর্তমানে কৃষিজমি হ্রাসের যে হার তাতে আগামী ৫০-১০০ বছরে দেশের সব কৃষিজমি নিষ্ট হয়ে যেতে পারে। এজন্য সমবায় ভিত্তিতে কাজ করা শুরু করতে হবে। এছাড়া কার্যকরী কৃষিনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে যেখানে কৃষিজমি ও সংরক্ষণাগারের মত বিষয়গুলো প্রাধান্য পাবে।

এখন কৃষিতে নীরবে পুঁজিবাদী অর্থনীতি পুরোমাত্রায় চালু হয়ে গেছে। গ্রামে অনেক সর্ম্পকের পরিবর্তন হয়েছে ও হচ্ছে, নতুন সর্ম্পক যখন তৈরি হয় তখন একটা যন্ত্রনা ও অস্থিরতা থাকে, সাময়িক সময়ে যেটা বিশৃঙ্খল ও উলট-পালট মনে হয়। প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকরা জমি ভাড়া বা বন্দোবস্ত নিয়ে বিনিয়োগ করার মত করে চাষাবাদ করছে। যাদের বেশী জমি তারা। ধনী কৃষক তারা কি আসলে কৃষক কিনা তাতে সন্দেহ আছে। দেখা যায় অনেক জমি আছে, কিন্তু ভাড়া দিয়ে অনুপস্থিতি জমির মালিক হয়ে আছে। আর মধ্যম কৃষকরা আগে জমিতে থাকলেও এখন তাদের দুই-তৃতীয়াংশ জমি ভাড়া দিয়ে চলে গেছেন। এটা কি কৃষির জন্য অনুকূল না প্রতিকূল?

কৃষি উৎপাদন যাতে আরও বিকশিত হতে পারে, তার জন্য ১টা অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এখন দরকার কৃষক কিভাবে এই ব্যবস্থাকে আরও এগিয়ে নিতে পারে। কৃষিজমি লীজ নেয়ার ক্ষেত্রে একটা অনিশ্চয়তা আছে, ১ বা ৩ বছর পর সে এই জমিটা আবার পাবে কিনা, অর্থাৎ প্রতিবছর নতুন চুক্তি করতে হয়। এর সমাধান কৃষকরা নিজেরাও করতে পারে বা সরকারও করতে পারে। যদি নিজেরা সমবায় করে এলাকার সব জমি ভাড়া বা বন্দোবস্ত নেয়ে তাহলে কৃষক নিজেই করতে পারে। আবার যদি সরকার করতে চায়, তাহলে কৃষক যাতে দীর্ঘমেয়াদীভাবে জমিটা পায় তাহলে সেটা দেখতে হবে। একসময় ভূমিসংস্কার নিয়ে অনেক কথা হয়েছিল, কিন্তু কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। এখন সরকার জমির মালিকদের কাছ থেকে জমি বিবর্তমান বাজারদরে ভাড়া নিতে পারে, তারপর সেটা কৃষকদের কাছে দীর্ঘমেয়াদী শর্তে ভাড়া দিতে পারে। এভাবে কৃষকের কাছে জমি দেয়া সম্ভব আবার কৃষিজমি হ্রাস করার হারও কমানো যেতে পারে।

এখন কৃষি উপকরণ ও উৎপাদিত পণ্যের দামের সামঞ্জস্য নেই। কৃষক বাজারে আটকে আছে মধ্যস্বত্বভোগীদের জন্য। যেহেতু সরকার বা অন্য কেউ কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না, সুতরাং কৃষকদের এগিয়ে আসতে হবে সমাধানের জন্য। এক্ষেত্রে কৃষকরা বিপিনন সমবায় গড়ে তুলতে পারে। যেখানে শুধু প্রকৃত কৃষক, ক্রেতা বা পাইকারের কাছে পণ্য বিক্রয় করতে পারবে। বর্তমানে চেট্টগ্রামের রাউজানে কৃষক সমিতি এরকম একটি কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এটা করতে গেলে কৃষকদের সংগঠিত হতে হবে, যেটা রাজনৈতিক ব্যাপার। রহিব এই কথাটা বলার চেষ্টা করছে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য রাজনৈতিক ছাতা হচ্ছে শক্তি। কৃষকদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে রাজনীতিবিদদের এগিয়ে আসতে হবে। রাজনৈতিক আদর্শ যাই হোক না কেন এখানে কৃষকদের স্বার্থটা দেখতে হবে, পাশাপাশি সিরকারকে সাহায্য করতে হবে।

এছাড়া আবাদযোগ্য জমি হ্রাস রোধ করার জন্য কার্যকরী ভূমি ব্যবহার নীতি করতে হবে। কৃষিপণ্য বাজারে আনা-নেয়ার জন্য অবকাঠামো ও এ সংক্রান্ত সেবা অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা রয়েছে সেগুলো ঠিক করতে হবে। সেচের বিষয়টা কৃষকরা সমবায়ের মাধ্যমে নিজেরা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করতে পারলে ভাল ফল পাবে, আমার মনে হয় চেষ্টা করলে এটা সম্ভব। শক্তিশালী কৃষক সংগঠন থাকলে যে কোন প্রকার কৃষি উপকরণ ভেজাল প্রতিরোধ করা সম্ভব।
কৃষেমজুরদের নিয়োগকর্তা হচ্ছে কৃষকরা। ১৯৯৬-৯৮ এর দিকে রংপুর অঞ্চলে মজুররা আগাম শ্রম বিক্রি করত ১০-১৫ টাকায়, এছাড়া কাজে আসার সময় সন্তানদের নিয়ে আসত কাজ করার জন্য, ব্যাপারটা অনেকটা দাস প্রথার মত ছিল। কৃষিতে পুঁজিবাদ শক্তিশালী হয়ে যাওয়ায় তারা এখন আধুনিক শ্রমিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে, ২০১৩ সালের শ্রম আইনে গ্রামীণ শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতিও পেয়েছে। এখন অনেক জায়গায় মজুর পাওয়া যায় না, কারণ খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্য যে টাকার দরকার কৃষকরা তা দিতে অপারগ। যদি মজুর ও কৃষকরা একসাথে বসে আলোচনার মাধ্যমে মজুরির হারটা নির্ধারণ করতে পারে, তাহলে দু'পক্ষই সন্তুষ্ট থাকবে।

সর্বোপরি রাজনৈতিক শক্তিই পারে কৃষকদের সমস্যার সমাধান করতে। এ ব্যাপারে অনেক আলোচনা হয়েছে, কিন্তু রহিব সব অস্পষ্টতা দূর করে সামনে আলোর রেখা নিয়ে এসেছে। এই লাইনে গবেষণা চললে এবং মাঠে গবেষণা করলে আশা করি দেশের অর্থনীতি ঠিক পথে এগোবে।

পরিশেষে বক্তারা একমত পোষণ করেন যে, কৃষি নিয়ে রাজনৈতিক আলোচনা আরও হওয়া দরকার। আর রহিব-এর এই শুভসূচনা ধন্যবাদ পাবার যোগ্য।